নাগরিক মঞ্চ
১৩৪ মাজা মাহেশ্বরী লাল মিত্র রোড,
ফ্ল্যাট - ৭, ব্লক - বি (দোতলা)
কলকাতা ৭০০ ০৮৪
ইমেল: nagarikmancha@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.nagarikmancha.org

শ্রমজীবী নারী কথা

শ্রমজীবী নারী কথা

নব দত্ত
জোনায়েদ রওসান মণ্ডল

নাগরিক মঞ্চ

Shramajeebi Nari Katha
Naba Dutta
Jonayed Rousan Mandal

শ্রমজীবী নারী কথা
নব দত্ত
জোনায়েদ রওসান মণ্ডল

প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ব: নাগরিক মঞ্চ

প্রকাশক
পবন মুখোপাধ্যায়, নাগরিক মঞ্চের পক্ষে
১৩৪ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড,
রুম - ৭, ব্লক - বি (দোতলা)
কলকাতা ৭০০ ০৮৫
হোয়াটস্‌অ্যাপ - ৯৮৩১১৭২০৬০
ইমেল: nagarikmancha@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.nagarikmancha.org

প্রচ্ছদ: সাগরিকা দত্ত

অলঙ্করণ, বিন্যাস ও মুদ্রণ: প্রিন্ট ডট কম
৯৮৩০১৩৫৩৮৩

মূল্য: ১০০ টাকা

মুখবন্ধ

নাগরিক মঞ্চের প্রকাশনার সম্ভবত একশ কুড়ি তম প্রকাশনা এই বইটি। বিষয় শ্রমজীবী নারী। পরিস্কার করে বললে কলে কারখানায় হাটে মাঠে যাঁরা কাজ করেন এমন মেয়েদের নিয়ে কিছু তথ্য, খানিকটা ইতিহাস, অনেকটা প্রশ্ন নিয়েই এই বই। শ্রমিকের বঞ্চনা, শোষণ, অমর্যাদা নিয়ে মঞ্চের অনেক কাজ তেত্রিশ বছরে হয়েছে। এমন একটি পুস্তিকা শুধুমাত্র নারী শ্রমজীবীদের নিয়ে হয়নি কেনো তার কোনো সদুত্তর আমাদের কাছেও নেই।

নারীর মানবাধিকার ও কর্মক্ষেত্রে নারীর যৌন হেনস্থা বিষয়ে দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছে সংহিতা। ২০১৮ থেকে বিশেষ ভাবে সংহিতা সংগঠনের সঙ্গে যুক্তভাবে চটকলে, চা বাগানে, স্কিম ওয়ার্কারদের নিয়ে সমীক্ষা, মিটিং, অধিকার সচেতনতার কাজ শুরু করে নাগরিক মঞ্চ। বাস্তব অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি জানা শোনার পরিবেশেই উপলব্ধি করি এমন একটি বইয়ের। ছোটো আকারে এই বইয়ে যে বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে তা নিয়ে আরো বেশ কিছু কাজ চলছে। সময়ে অবশ্যই তা প্রকাশ হবে। এই বইয়ের কিছু কথা কিছু তথ্য বিশ্লেষণ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ নাগরিক মঞ্চের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিভাস ব্যানার্জি স্মারক বক্তৃতায় আলোচনা হয়েছিল।

সম্পাদক
নাগরিক মঞ্চ
১৫ জানুয়ারি ২০২৩

এক

ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ। ২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা ১২১ কোটি ৮ লক্ষ, এর মধ্যে ৫৮ কোটি ৬৪ লক্ষ মহিলা।

কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সি আই আই) রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০তে ভারতে মোট জনসংখ্যার ৬৭ শতাংশ অর্থাৎ ৯০ কোটি কর্মজীবী আছেন, (যাঁদের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে) ২০৩০ সালে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াবে ১০০ কোটিতে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (এন এস এস ও) ২০১৭-১৮ সালের এক তথ্যে জানা যায়, ভারতে প্রায় অর্দ্ধেকের বেশি কর্মজীবী মানুষ (যাঁদের বয়স ১৫ বছর বা তার বেশি) কোনরকম অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত নয়।

পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে, ২০১৭-১৮ সমীক্ষায় প্রকাশিত ভারতে মোট কাজে যুক্ত মানুষ জনসংখ্যার ৪৯.৮ শতাংশ। ২০০৪-০৫-এ যা ছিল ৬৩.০৭ শতাংশ, ২০১১-১২-য় ৫৫.৯ শতাংশ। অর্থাৎ কিনা কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা জনসংখ্যার মধ্যে ক্রমশ কমছে। এই তথ্যেই দেখা যাচ্ছে ২০১১-১২ এবং ২০১৭-১৮ সালে সক্রিয় শ্রমিক-এর সংখ্যা ৮ শতাংশ হারে কমেছে। লক্ষণীয় হলো নারী শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুণ হারে কমেছে।

২০১১-এ সর্বশেষ সেনসাস তথা জনগণনা অনুযায়ী মোট কর্মীসংখ্যা ৩৪ কোটি ৫৬ লক্ষ। প্রতি দশ বছর অন্তর মোট কর্মী সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় হলো বৃদ্ধির হার যথেষ্ট কমেছে, যেমন ধরুন ১৯৮১-৯৯ সালে বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ৩৩.১ শতাংশ, ১৯৯১-২০০১ সালে সেখানে হয়েছে ৩৪.৬২ শতাংশ, ২০০১ সালে সেটা হয়েছে অর্দ্ধেকেরও কম, ১৭.৮ শতাংশ।

ওপরের এই সব মোট কর্মজীবী মানুষের সংখ্যাতত্ত্ব তুলে ধরার কারণ হলো এই সব তথ্যের (যার অধিকাংশ সূত্র ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক)

মধ্যে দিয়ে কিভাবে সারা দেশজুড়ে সবার জানা বোঝার সম্মতি নিয়ে দেশে মোট কর্মজীবী ও মহিলা শ্রমজীবীর অবিশ্বাস্য সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটল।

ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রকের দ্বারা বহুল প্রচারিত ইশ্রম নিয়ে এখনও কোনো স্তরেই আমরা সমালোচনা দেখিনি, বিশেষ করে শ্রমিক সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয়ভাবে এই নিয়ে কোনো বিরোধিতা বা বিরূপ মন্তব্য চোখে পড়েনি। বিশ্বজিৎ ধরের মত বন্ধু অর্থনীতিবিদ এর প্রাসঙ্গিক সমালোচনা আমাদের এই বিষয়ে বিশদ জানতে বুঝতে সাহায্য করেছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক জাতীয় স্তরে তথ্যভান্ডার বা ডেটাবেস তৈরী করতে ২০১৯ ই-শ্রম পোর্টাল তৈরী করে। বলা হলো দেশের অসংগঠিত প্রতিটি শ্রমিক তাঁর আধারের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ ও নিজস্ব কিছু ব্যক্তিগত তথ্য যথা নাম, বয়স, ঠিকানা, পেশার ধরণ, পারিবারিক আয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতার ধরন ও পারিবারিক বিবরণ, সেভিংস ব্যাংকের পাশবুকের তথ্য ও কপি নথিভুক্ত করবেন। ২০১৯ ইশ্রম তৈরি হলেও ২০২১ আগস্ট থেকে রেজিস্ট্রেশনের কাজ শুরু হল। ১৬ বছর বয়স থেকে ৫৯ বছর বয়সের যে কেউ ইশ্রমে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। যাঁরা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কর্মী বা ইএসআই, পিএফ আছে তাঁরা ই শ্রমে নথীভুক্ত হতে পারবেন না।

ই শ্রমে অন্তর্ভূক্তির ফলে শ্রমিকরা কি ধরনের সুবিধা পাবেন সেটা খুব একটা স্পষ্ট নয়। বলা হয়েছে ই শ্রম কার্ড যাদের থাকবে তারা প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। ২ লাখ টাকার দুর্ঘটনা বীমার আওতায় পড়বেন। এই বীমা প্রকল্পের প্রিমিয়াম সরকার দেবেন। কেন্দ্রীয় সরকার ই শ্রমে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে নিচ্ছেন শুধু তাই নয়, তাদের উপদেষ্টারা বলছেন, এর মাধ্যমে অসংগঠিত শ্রমকে 'ইনফর্মাল' থেকে 'ফর্মালাইজেশন' অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকীকরণ করা হচ্ছে। বোঝা গেল না একদিকে ২০১৯-২০ দেশে ৪৪টি শ্রম আইনকে কার্যত বাতিল করে ৪টি লেবার কোড তৈরী করা হলো, শ্রমিকের অধিকাংশ অধিকার নিয়োগকর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হলো। অন্যদিকে সারা দেশে কর্মজীবী মানুষের প্রায় ৯০ শতাংশ, যারা অসংগঠিত বা অসুবক্ষিত, তাদের ই শ্রমের মাধ্যমে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রায় কোনো সুবিধা

না দিয়েই যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হলো, যা এখনও চলছে। এই ই শ্রমের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে আমরা এখানে একটি তথ্য তুলে ধরতে চাই, যেখানে দেখা যাচ্ছে দেশের শ্রমব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটছে। অন্তত প্রকাশিত ভারত সরকারের ডাটাবেস থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে।

২০শে ডিসেম্বর, ২০২২ ভারত সরকারের ইশ্রম রেজিস্ট্রেশন এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, নারী পুরুষের অনুপাত যথাক্রমে ৫২.৮১ শতাংশ নারী ও ৪৭.১৯ শতাংশ পুরুষ, মোট ই শ্রমে রেজিস্ট্রেশনের ১৫কোটি ৬ লাখ নারী শ্রমজীবী।

ই শ্রমে রেজিস্ট্রেশনে পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় নারী শ্রমিক সংখ্যায় বেশি, বেশ কয়েকটি রাজ্যে যেমন মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, বিহার, ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গে মোট ই শ্রমে রেজিস্ট্রেশন (২০-১২-২২) ২ কোটি ৫৭ লাখ ২৫ হাজার, এর মধ্যে নারী শ্রমিক ১ কোটি ৪০ লাখের মতো অর্থাৎ মোট শ্রমিকদের মধ্যে ৫৪.২২ শতাংশ।

সেন্সাসের তথ্য অনুযায়ি পশ্চিমবঙ্গে মুখ্য ও প্রান্তিক ক্ষেত্র মিলিয়ে নারী শ্রমিক ৮০ লাখ -এর মধ্যে ৩৭ লাখ ফর্মাল সেক্টরে, ৪৩ লাখ ইনফর্মাল সেক্টরে কাজ করেন। অবিশ্বাস্য এই বৃদ্ধি! প্রশ্ন হলো সারা দেশেই কর্মরত নারী শ্রমিক সংখ্যায় পুরুষ শ্রমিকদের থেকে বেশি হলো কি করে? কিভাবে শংসাপত্রের মাধ্যমে এই সব ব্যক্তিগত তথ্যকে প্রতিষ্ঠা করা হলো? সারা দেশের সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য সরকারি/বেসরকারি তথ্য যেখানে তুলে ধরছে সমস্ত রাজ্যে নারীদের কর্মসংস্থান কমছে, সেখানে এই বিপুল বৃদ্ধি কিভাবে তথ্যের কারচুপিতে গ্রহণযোগ্য হলো? আমাদের প্রশ্ন থাকবে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এই ব্যাপক তথ্যের গরমিল নিয়ে যথেষ্ট সোচ্চার নয় কেন? আমাদের প্রশ্ন থাকবে এই গোঁজামিল তথ্যের উপর ভিত্তি করে শ্রমজীবীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি নারী শ্রমজীবীর সংখ্যাধিক্যকে নিজেদের সাফল্য বলে তুলে ধরবেন কি না? আমাদের প্রশ্ন থাকবে ই শ্রম চালু করার সময় ভারত সরকার-এর রেজিস্ট্রেশনে অসংগঠিত

শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ কোটির মধ্যে থাকবে বলা হয়েছিল। প্রায় এখন ২৯ কোটি (৫ জানুয়ারি, ২০২৩) রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হয়েছে। বারো বছর আগের সর্বশেষ সেনসাস-এর তথ্য অনুযায়ি ভারতে মোট কর্মী সংখ্যা ৩৯ কোটি, তাহলে কি মোট কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে? যদি তাই হয় প্রায় কাছাকাছি প্রশ্ন হলো তাহলে হঠাৎ করে ই শ্রমের রেজিস্ট্রেশনে নারী কর্মী সংখ্যা এতটা বাড়ল যে পুরুষদের থেকে ছাপিয়ে গিয়ে ৫২ শতাংশের বেশি হয়ে গেল?

সারণী ১.১: রাজ্যভিত্তিক পুরুষ/নারী শ্রমিক রেজিস্ট্রেশন (শতাংশে)

রাজ্য	পুরুষ	মহিলা
পশ্চিমবঙ্গ	৪৫.৭৮	৫৪.২১
মহারাষ্ট্র	৪৯.০৭	৫০.৯৩
গুজরাট	৫৪.১১	৪৫.৮৯
উত্তরপ্রদেশ	৪৭.৬৫	৫২.৩৫
তেলেঙ্গানা	৪৯.৫	৫০.৯৪
তামিলনাড়ু	৩৮.০৬	৬১.৯৩
পাঞ্জাব	৪৪.৭	৫৫.৫২
বিহার	৪৪.০১	৫৫.৯৯
ভারতবর্ষ	৪৭.১৯	৫২.৮১

তথ্যসূত্র: ই-শ্রম (২০ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)

সারণী ১.২: রাজ্য ভিত্তিক মোট সংখ্যায় পুরুষ/নারীশ্রমিক রেজিস্ট্রেশন

রাজ্য	পুরুষ	মহিলা	মোট রেজিস্ট্রেশন
পশ্চিমবঙ্গ	১১১৭৬,৫২৫	১৩৯,৪৬,৬১৯	২৫৭,২৩,১৪৪
মহারাষ্ট্র	৬৫,৫৫,৭১৮	৬৮,০৪,৯৩২	১৩৩,৬০,৬৫০
গুজরাট	৪৯,২০,৯৮০	৪১,৭৩,৫২০	৯০,৯৪,৫০০
উত্তরপ্রদেশ	৩৯৫,৩৯,৭৭৯	৪৩৪,৪১,৯৫৫	৮২৯,৮১,৭৩৪
তেলেঙ্গানা	১৯,৬৭,৫৬৯	২০,৪৩,২৬০	৪০,১০,৮২৯
তামিলনাড়ু	৩১,৫৪,২১০	৫১,৩২,৬২২	৮২,৮৬,৮৩২
পাঞ্জাব	২৪,৪২,৮৮৭	৩০,৪৯,৯৮২	৫৪,৯২,৮৬৯
বিহার	১২৫,৫২,৭৯৭	১৫৯,৭১,২৯২	২৮৫,২৪,০৮৯
ভারত	১৩৪৪,০৬,৬০৪	১৫০৪,১৯,৯৮৭	২৮৪৮,২৬,৬০১

তথ্যসূত্র: ই-শ্রম (২০ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)

সারণী ১.৩: রাজ্য ভিত্তিক পেশাগত ভাগ (ই-শ্রম)

	কৃষি	নির্মাণ	গৃহকর্মী এবং অন্যান্য	পোশাক	তামাক শিল্প	ঘরোয়া	ডেলিভারি বয়/ ভোর টু ভোর সেলস ব্যক্তি	শিক্ষা	অটোমোবাইল এবং পরিবহন	স্বাস্থ্য পরিষেবা	চামড়া শিল্প	খনি
পশ্চিম বঙ্গ	১৩০,৫ ৮,৭৪৩	২২,৩৫, ৭৬৬	২১,৫০, ৩৯১	২১,২০, ৮০৪	১২,৪৩, ৮২৯	৫,৬৩, ৩৪৮	৩৮৩৯২	৬,৪৫, ৪৮০	৫,৯৬,৪৮১	১,৮১, ০৪৩	৮৬,১৭৯	২৬,৯১৬
মহারাষ্ট্র	৬৩,৪৪, ৩৩৫	১০,৪২, ৬৮৪	৬,৮৫, ৬২২	৬,৬৪, ৫১৩	২১,০১৫	৩২,২৮৭	৩৪,৫৯২	১,০১, ৭০১	৫,৩১,৯৮১	১,৬৬, ১৮৪	৬,৭৪, ৩২৪	৭,৭১৫
গুজরাট	৫২,২৪, ৬৬৯	৪,২৪, ৫৫০	৬,২৪, ৭১২	৪,২৬, ৮৩২	৬,৭১৯	২৮,৫৯৭	১৯,৩৫১	৫৫,৯০২	২,৯৯,৩৮৪	১,৮৬, ২২৬	২,৪১, ৫২২	১২,৫৭৭
উত্তরপ্রদেশ	৪০৩,২	৫৮,৯২, ৯,৪৭৫	১৩০,৩৭, ২১৩	৫২,৫৮, ৯৮২	১,৭৮, ৩২২	৩,২৫, ৩৮৬	৯৭,১৪৩ ৯৫৪	১৮০, ৫৩৮৭	১৭,০২,৬১৬	৭,৬৬, ২৯৩	১৯,০৬, ৬৬	১,৪৫,২৬৬
তেলেঙ্গানা	২৪,৮৯, ৩২০	২,৪৯,৮৮৫	৫৫,৯০৩	২,১৪,৯২	৪৪,৭০১	৬,৬০০	৬,৭৭৩	৫২,০৪৪	২,২১,৪০১	৯৫,০২৫	৪১,২৮৪	৪,১৫৩
তামিলনাড়ু	৫০,৫০, ৬৫৫	১০,২৫, ৯৭৩	১,০৬, ২৫৪	৫,৫৩, ১৬৪	২১,৭৩৯	১১,০৯১	১০,৪২৫	৭১,৬০৭	৩,৩২,০২৯	৫৯,৭৭৯	৪৪,২৩২	৬,১৬৫
পাঞ্জাব	১৩,৩৯, ৪৬০	৯,৬০, ৫৫৩	৮,৬৫, ২৭৯	৫,৯৯, ৬৭৫	২২১	১,৬০, ৮৪০	৯,৪১৪	৯৪,৭৬৩	১,৮৪,৫৪৫	৬২,৪৪৮	১,১৩, ৫২২	১০,৮৪২
বিহার	১৪১,২ ৫৯০,৮	২৮,২৪, ৬০৮	৪২,০১, ৬০৯	১৬,৬৫, ৯০ ৭	৯০,৬৪০	১,৩৬, ০০৬	২০,৫৯০	৫,০৪, ২১৮	৬,৪৯,২২০	৩,৪৩, ০৩৮	৪,৮৪, ৬৬ ৭	৩৫,৮৪৭
ভারত	১৪৯২,৯৮, ৫৩০	২৮৭,৬ ৭,৯৩৬	২৫৫,৭৫, ৪১০	১৭৮,২ ১,৬২২	২১,১২, ৩০১	১৬,৭৪, ৩১৭	৩,৬৬,৯১০	৪৪৪,৪ ৬,৪৩৩	৭৯৪৪,৩৮৮	১,৮১, ৪২৭	৫৫,৩৮, ৩৪০	৪,৩০,২০৪

তথ্যসূত্র: ই-শ্রম (২০ডিসেম্বর২০২২পর্যন্ত)

সারণী ১.৪: পশ্চিমবঙ্গে ই-শ্রমে পেশাগত ভাগ

পেশা	পশ্চিমবঙ্গ	শতাংশ
কৃষি	১৩০,৫৮,৭৪৩	৫০.৭৭
নির্মাণ	২২,৩৫,৭৬৬	৮.৬৯
গৃহকর্মী এবং গৃহকর্মী	২১,৫০,৩৯১	৮.৩৬
পোশাক	২১,২০,৮০৪	৮.২৪
তামাক শিল্প	১২,৪৩,৮২৯	৪.৮৪
ঘরোয়া	৫,৬৩,৩৪৮	২.১৯
ডেলিভারি বয়/ ডোর টু ডোর সেলসব্যক্তি	৩৮,৩৯২	০.১৫
শিক্ষা	৬,৪৫,৪৬০	২.৫১
অটোমোবাইল এবং পরিবহন	৫,৯৬,৪৮১	২.৩২
স্বাস্থ্য পরিচর্যা	১,৮১,০৪৩	০.৭০
চামড়াশিল্প	৮৬,৪৪৫	০.৩৪
খনি	২৬,৯১৬	০.১০

তথ্যসূত্র: ই-শ্রম (২০ডিসেম্বর২০২২পর্যন্ত)

সারণী ১.৫: সেনসাস মোট মহিলা কর্মজীবী (পশ্চিমবঙ্গ)

				দশকে বৃদ্ধির হার (%)	
	১৯৯১	২০০১	২০১১	১৯৯১-০১	২০০১-১১
মোট কর্মজীবী সংখ্যা (লাখ)	২১৯.১৫	২৯৫.০৩	৩৪৭.৫৬		
মোট মহিলা কর্মজীবী (লাখ) (মুখ্য + প্রান্তিক)	৩৬.৬৩	৭০.৯৪	৮০.৪	৯৩.৬৭	১৩.৩৩
শতাংশ	১৬.৭১	২৪.০৪	২৩.১৩		

চিত্র - ১.১: রাজ্যভিত্তিক পুরুষ / নারী শ্রমিক রেজিস্ট্রেশন (শতাংশে)

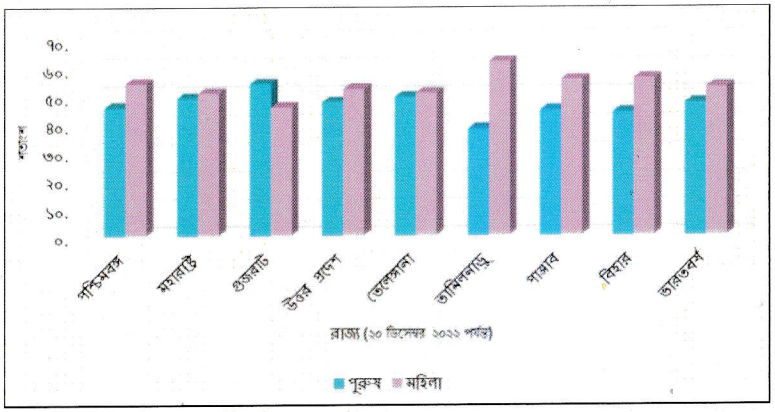

চিত্র - ১.২ মহিলা কর্মজীবীর বৃদ্ধির হার (মুখ্য + প্রান্তিক)
১৯৯১ – ২০১১

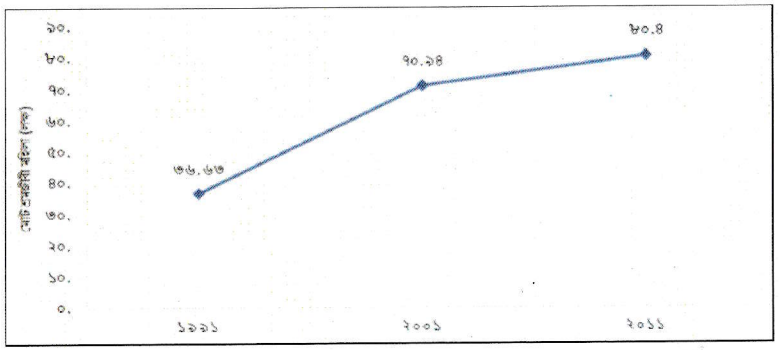

চিত্র - ১.৩: পশ্চিমবঙ্গে নারী কর্মীসংখ্যা (শতাংশ)

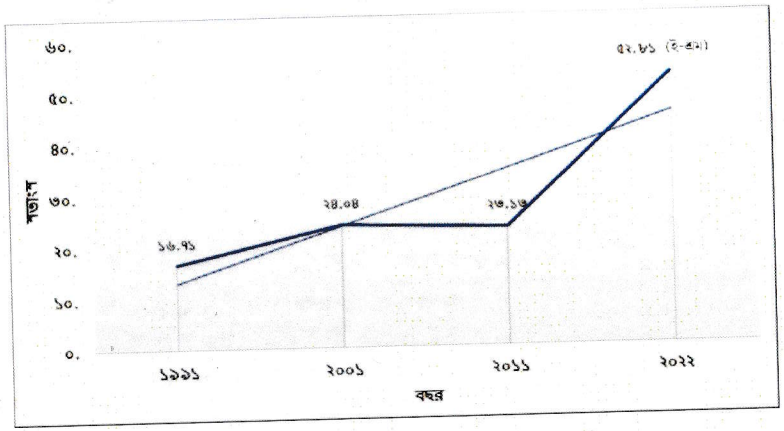

চিত্র - ১.৪: পশ্চিমবঙ্গে ই-শ্রমে পেশাগত ভাগ

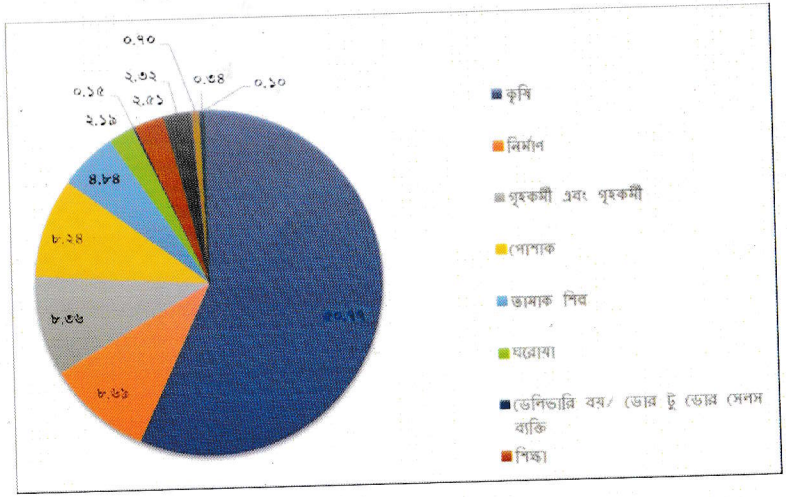

দুই

মহিলাদের কর্মসংস্থানের বিষয় গত দু দশকের যে হিসেব আমরা দেখতে পাই তাতে দেখা যায় ২ কোটি ১০ লাখের মতো কর্মসংস্থান মহিলাদের কমেছে। অন্যদিকে পুরুষদের ২ কোটির বেশি কর্মসংস্থান বেড়েছে। সমগ্র দেশে গ্রামীণ ক্ষেত্রে মহিলা কর্মসংস্থান কম। পুরুষ কর্মসংস্থান বেশি, এর মূল কারণ হল পুরুষদের কাজ নেই। পুরুষ-মহিলা উভয়েরই যেখানে কাজ নেই, সেক্ষেত্রে পুরুষরা স্বাভাবিকভাবেই মহিলাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং যথারীতি কর্মসংস্থানটা নিয়ে নিচ্ছে। আসলে নারী কর্মীদের কর্মসংস্থান কমার কারণ হিসাবে তাঁদের জন্য আলাদা সুরক্ষা ব্যবস্থা করতে হয়, ইত্যাদি বলার মধ্যে একটা নেতিবাচক প্রেক্ষিত তৈরি করা হয়। তাঁদের অনুৎপাদনশীল বলা হয়। ইউনিয়ন এর কোনো প্রতিবাদ করছেনা। নারীদের কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে বক্তব্য অবস্থান আবার কেমন পাল্টে যায় তা প্রত্যক্ষ করছি বর্তমানে বাংলায়। বাংলার জুট মিলে এখন প্রচুর মহিলাদের কাজে নেওয়া হচ্ছে, এমনকি জুটমিল কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে জোরালো আবেদন জানাচ্ছে, রাতের শিফটে কাজ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য, মিল মালিকরা জানাচ্ছেন মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করতে চাওয়ার কারণ তাঁরা নাকি 'ডিসিপ্লিন্ড'! উৎপাদন বেশি দেন, কামাই করেন কম ইত্যাদি। আসল কারণ হলো জুট মিলে মজুরি কম, কাজের বোঝা অনেক বেশি। পুরুষ শ্রমিকরা অনেকেই যখন জুটমিলের বাইরে কাজ খোঁজার চেষ্টা করছেন, পেয়ে গেলে কম মজুরিতে কাজ করতে চাইছেন না, ফলে কর্মী অপ্রতুলতার কারণে নারী শ্রমিকদের কাজে নিয়োগের সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি অধিকাংশ নারী শ্রমিক জুটমিলে অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন, মাস্টার রোলে নাম নেই। চা বাগানে একইভাবে মহিলা শ্রমিক বাড়ছে কারণ ন্যুনতম মজুরি ২৩২ টাকায় পুরুষ শ্রমিক কাজ করতে চাইছে না। স্বল্প মজুরি, নির্ধারিত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চনার মধ্য দিয়ে নারী কর্মীর সংখ্যা হয়ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাড়ছে, সেটার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে আসলে যাবতীয় শ্রমিক হিসাবে অধিকার এবং নারী শ্রমিকের জন্য স্থিরীকৃত অধিকার অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে।

চল্লিশের দশকে সত্তর হাজার নারী শ্রমিক বাংলার জুট মিলে কাজ করত, তারপর কমতে কমতে দাঁড়ালো সাকুল্যে সবমিলিয়ে সাতশো, জুট মিলে পঞ্চাশের দশক থেকে একটার পর একটা চুক্তি আর শ্রমিক কমানো, কাজের বোঝা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের ওপর চাপানো শুরু হল। এরই ধাক্কায় হাজার হাজার নারী শ্রমিক কর্মহীন, মেকানাইজেশনের ধাক্কা আর ট্রেড ইউনিয়নের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের ফলস্বরূপ যথোপযুক্ত প্রতিরোধ করতে না পারায় বিপুল পরিমাণ নারী শ্রমিক কাজ হারালো জুটমিলে।

২০১৮ থেকে সংহিতা ও নাগরিক মঞ্চ একসঙ্গে জুটমিলে নারী শ্রমিকদের অস্তিত্ব, অধিকার, আইন ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার বিষয় নিয়ে বাংলার জুট মিলে ঘুরে ঘুরে সমীক্ষা এবং আঞ্চলিক স্তরে বেশ কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নের সহযোগিতায়, সমাজকর্মীদের উদ্যোগে, নারী শ্রমিকদের নিয়ে সচেতনতা শিবির চালাচ্ছে।

উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের সবচেয়ে শিল্পোন্নত রাজ্যের মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলা। বাংলা দেশে চটকল, কয়লাখনি, চা বাগিচা, বন্দর ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেও বহু ছোটবড় কারখানা গড়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলায় দ্রুত কারখানার প্রসার ঘটে, প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান বাংলায় পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় বিহার, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাঁচি, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, এই সব অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা আসতে থাকে।

তিরিশ চল্লিশের দশকে বাংলায় কয়েকটি শিল্পে নারী শ্রমিকের একটি হিসেব পাওয়া যায়:

চা বাগান	**মোট নারী শ্রমিক**
(দার্জিলিং, ডুয়ার্স, তরাই)	৮১,৭১১ (মোট শ্রমিকের অর্দ্ধেক)
কয়লাখনি	১৫,৪৯৮
চটকল	৩৬,০৫৫ (মোট শ্রমিকের ১৩ শতাংশ)
(১০১টি)	
চালকল	৮০০০ (মোট শ্রমিকের অর্দ্ধেকের বেশি)
(৩৯২টি)	

(সূত্র : ছবি রায়, বাংলার নারী আন্দোলন: সংগ্রামী ভূমিকায় দেড়শ বছর)

এছাড়া ঐ সময় ছোটো শিল্পে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেই সময় চটকলে, কয়লা খনিতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মোট শ্রমিকের ১৫ শতাংশ। তখন চটকলে একটা বিভাগে শুধু মেয়েরাই কাজ করত। ধানকল ও চা বাগানে মেয়ে মজুরের সংখ্যা ছিল ৫০ শতাংশ, কোথাও তার চেয়ে বেশি। এছাড়া জমাদার, মেথর, ধাঙড়দের মধ্যে বড় অংশ মহিলা শ্রমিক। পটারী, রেশম শিল্প, বিড়ি তৈরী, গৃহনির্মাণ, ইঁটভাটায় এবং শস্য ক্ষেতে নারী শ্রমিকদের সংখ্যাই বেশি ছিল।

১৯২০-তে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হল বোম্বাই-এ। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে নারী শ্রমিকদের দাবী সমর্থন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় – "এই মহাসম্মেলনের অভিমত যে প্রত্যেকটি কলকারখানা যেখানেই নারী শ্রমিকরা কাজ করে সেখানেই বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে কাজের সময় মেয়েরা তাদের সন্তানকে নিরাপদে রাখতে পারে।" একশ বছর আগে ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে নেওয়া সিদ্ধান্ত আজও সারা দেশে কার্যকর হলো না। ভারতে মহিলা শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য কর্মক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ক্রেশ রাখার আইন আছে। সারা দেশে ফ্যাক্টরীতে সংস্থায় মহিলা শ্রমিকদের জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে আঠারো হাজার নথিবদ্ধ কারখানা সংস্থায় একটিও ক্রেশ নেই। অথচ ফ্যাক্টরী অ্যাক্টের ৪৮ ধারায় বলা আছে প্রত্যেকটি ফ্যাক্টরী সংস্থা যেখানে ৩০ জন মহিলা শ্রমিক কাজ করেন সেখানে ক্রেশ রাখতে হবে। পঞ্চাশ-ষাঠের দশকে জুট মিলে প্রচুর মহিলা শ্রমিক কাজ করত, তখনকার সময়ে জুট মিলে ক্রেশ ছিল। আজ আবার মহিলা শ্রমিক কাজে ফিরলেও কোনো জুটমিলেই ক্রেশ নেই। ২৫জন মহিলা শ্রমিক কর্মী পিছু একটি করে শৌচাগার থাকতে হবে। দুহাজার বাইশের বছরের শেষ দিনে ভদ্রেশ্বরে জুট মিলের মহিলা শ্রমিকদের সভায় শুনতে পেলাম, সেখানে একাধিক জুট মিলে লাইন ড্রেন বাথরুম রয়েছে, অর্থাৎ একটি নর্দমার উপর পাঁচিল দিয়ে আড়াল তৈরী করে সেটিকেই মহিলা শ্রমিকদের শৌচাগার বলে চালানো হচ্ছে। আজও নিরাপত্তার অভাববোধ থেকেই একজন মহিলা শ্রমিক একা বাথরুম বা শৌচাগার যায়না, সঙ্গে সঙ্গী করে নিয়ে যায় 'পাহারাদার'! অন্য সহকর্মীকে।

রাজ্য	ক্রেশের সংখ্যা
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪৪০
অসম	৩০
গুজরাট	৫৮
ঝাড়খন্ড	১০
মহারাষ্ট্র	২৫৮
উড়িষ্যা	৪৫
পাঞ্জাব	১২
রাজস্থান	২৬
তামিলনাড়ু	২৩৮৯
পশ্চিমবঙ্গ	০

সূত্র ঃ Statistical Profile on women labour, Labour Bureau,] Ministry of Labour & Employment Government of India - 2012-13.

The Maternity Benefit Act, 1961, Amended in 1995

মাতৃত্বকালীন সুবিধা সম্পর্কিত এই আইন ১৯২৪ সালে স্বাধীনতার আগে থেকেই এই আইন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আই এল ও বহুবার মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিয়ে সম্মেলন করেছে। ১৯৬১ সালে যখন আইনটি পাশ হল—বলা হয়েছিল যে, এই আইনের লক্ষ হচ্ছে একজন মহিলা যখন সন্তান ধারণ করছেন তখন সামগ্রিকভাবে সমাজ সেই দায় ও দায়িত্ব ভাগ করে নিচ্ছে যাতে সেই শিশুটি সুস্থভাবে যেন পৃথিবীতে আসে। পরবর্তীকালে যাতে সে সুস্থভাবে বড় হতে পারে তার জন্য শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য – সমস্ত ব্যাপারে সচেতন থেকে সেই পরিবারকে বিভিন্নভাবে সহায়তার হাত এগিয়ে দেওয়া। এই বিষয়ে মালিক তথা কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ। শিশু জন্মানোর আগে ও পরে মোট ছয়মাস সবেতন ছুটি পাওয়া যায়। এছাড়াও মহিলা শ্রমিক, কর্মীর

শিশুটির দেড় বছর বয়স পর্যন্ত সেই মহিলা কর্মীকে নিয়মিত কাজ দিতে হবে অর্থাৎ তাঁকে ভারী কাজ দেওয়া যাবে না। তাঁকে দিনে নির্দিষ্ট ৬ ঘন্টার বেশি কাজ দেওয়া যাবে না। আরও কিছু বিষয় যা আইনের অন্তর্ভুক্ত যেমন সেই শিশুটিকে কর্মক্ষেত্রে থাকার ব্যবস্থা অর্থাৎ ক্রেশে রাখতে হবে, শিশুটি যাতে কোনভাবে মুষড়ে না পড়ে বা একাকিত্বে না ভোগে তার জন্য একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং খেলনা বা খেলার ব্যবস্থা রাখতে হবে। আইনে আরও বলা আছে, যেন মা ও শিশু দুজনেই দুপুরে খাবার পান। কী খাবার দেওয়া হবে সেটাও বলা আছে। কোন অবস্থাতেই মাতৃত্বকালীন অবস্থায় শ্রমিককে ছাঁটাই করা যাবে না।

আমরা মাতৃত্বকালীন সুবিধা বলতে মাতৃত্বকালীন ছুটি বুঝি, এই ভাবে মাতৃত্বকালীন সুবিধার অর্থ ছুটির মাধ্যমে সংকীর্ণ করে ফেলা হয়েছে। এখানে শুধু ছুটি নয়, গর্ভবতী অবস্থায় শ্রমিকের প্রাপ্য সুবিধার কথা বলা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে নথিবদ্ধ সংস্থা এই আইনে রয়েছে মাত্র ৪২৫টি। তরাই, ডুয়ার্স, দার্জিলিংয়ে চাবাগান আছে ৩০০টির মত যেগুলি এই আইনে রেজিস্টার্ড।

ভারতে মোট ৪৫ হাজারের মত রেজিস্টার্ড কারখানা রয়েছে। বাগান রয়েছে ৩২০০। এর মধ্যে ১৪ হাজার ৫০০-র মত সংস্থা অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ কারখানা মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইনের আওতাভুক্ত।

ট্রেড ইউনিয়নের সীমাবদ্ধতা হল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মেটারনিটি বেনিফিট আইনটিকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করেনি। উল্লেখ্য ব্যতিক্রম আমাদের বাংলার চা বাগান, এখানকার শ্রমিক সংগঠনগুলি মাতৃত্বকালীন সুবিধার দাবী নিয়ে সোচ্চার হয়েছে এবং বর্তমানে অধিকাংশ বাগানে মহিলা শ্রমিকরা এই সুবিধা পায়। অন্যত্র কর্মক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিক, কর্মী যেখানে কাজ করেন মাতৃত্বকালীন সুবিধার বিষয় নিয়ে বলার মতো শ্রমিক আন্দোলন হয়নি। জুটমিলে সবকটি ইউনিয়ন একত্রে যে দাবীসনদ পেশ করেছেন তাতে মহিলা কর্মীদের জন্য ক্রেশের সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি ও কর্মক্ষেত্রে যৌন

হেনস্থা ২০১৩ আইন কার্যকর করার দাবী করা হয়েছে। এসব দাবীদাওয়া ট্রেড ইউনিয়নের তরফে দেওয়া হলেও বাস্তবে ব্যক্তিগতভাবে নারী কর্মীকে লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে তাঁরা যেন এই আইনের অধীনে কোনরকম সুবিধা না চান, তবেই তাঁকে চাকরি দেওয়া হবে। যদি কেউ একান্তই চান তবে তা হবে বেতন ছাড়া ছুটি। যেখানে সংগঠিত ক্ষেত্রে এই ধরনের শর্তভিত্তিক কাজ হচ্ছে সেখানে অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই মাতৃত্বকালীন সুবিধা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও) এই আইনে বলা অধিকার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হিসাবেই দেখতে চাইছে। সেই জন্যে পরিবর্ত হিসাবে নিয়োজক সংস্থা বা মালিক, কর্মী এবং রাষ্ট্রের অবদান নিয়ে একটা ফান্ড তৈরি করে কাজে লাগানোর কথা ভাবা হয়েছিল।

সমকাজে সমবেতন আইন দেশে চালু হল দেশে তখন জরুরী অবস্থা চলছে। The Equal Remuneration Act ১৯৭৬ আইনে বলা হল একই কাজের জন্য পুরুষ ও নারীকর্মী একই বেতন পাবেন। এই আইনের পঁয়তাল্লিশ বছর পেরিয়েছে। আজও সমকাজে সমবেতন অধরা রয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আলাদা ভাবে বলতে গেলে এই আইনটি নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য আন্দোলন করেনি। জুটমিল নারী শ্রমিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ শ্রমিকদের সমান কাজ করলেও সমান বেতন পায় না। পুরুষদের অবসরের বয়সসীমা ৫৮ বছর হলেও নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা ৫৫ বছর। এই ধরনের বৈষম্য চালু রয়েছে আজও।

একই কাজে একই মেশিনে একজন পুরুষ শ্রমিক যা মজুরি পায় তার কমে নারী শ্রমিককে কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। ক্রেশ নেই, পরিচ্ছন্ন টয়লেট নেই, পোষাক ছাড়ার আলাদা ঘর নেই, মাতৃত্বকালীন ছুটি নেই। অধিকাংশ নারী শ্রমিকের মাস্টার রোলে নাম নেই – ভাউচার শ্রমিক একশ টাকা থেকে শুরু হয়ে চারশ টাকা – হরেক রকম মজুরি। নানান মিলে শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট কোন মজুরি স্কেল নেই – এসব আসলে চুক্তিতে আছে, বাস্তবে নেই। চলছে মালিক আর তাদের অনুচরদের সর্দারদের, ম্যানেজারদের মিলের ভেতর নিজস্ব আইন – কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। নারী পুরুষ নির্বিশেষে যার শিকার।

সারা দেশে নারী পুরুষের বেতন বৈষম্য যা ২০১৯ তথ্যে সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে। একজন পুরুষের থেকে নারী কর্মী একই কাজের বিনিময়ে ১৯ শতাংশ বেতন কম পান। পুরুষকর্মী যেখানে ২৪২.৪৯ টাকা পান সেক্ষেত্রে নারীকর্মী পান ১৯৬.৩০ টাকা অর্থাৎ ৪৬.১৯ টাকা কম পান।

নীচের সারণীর দিকে তাকালে পশ্চিমবঙ্গের নারী ও পুরুষ কর্মীদের কয়েক বছরের বেতন বৈষম্যের পরিসংখ্যানের চিত্র পাওয়া যাবে।

সাল	পুরুষ কর্মীর বেতন	নারী কর্মীর বেতন
২০০৫-০৬	২২১.৯০	১৪১.২৫
২০০৬-০৭	২৩০.১০	১৪৪.৭২
২০০৭-০৮	২৫২.৮৮	১৫৫.৭৪
২০০৯-১০	২৪৮.৬২	১৮৫.২৫
২০১১-১২	১৮৪.০০ (ক্যাজুয়াল শহুরে শ্রমিক)	১১২.০০
” ”	৪৭০.০০ (রেগুলার শহুরে শ্রমিক)	৩৬৫.০০

সমকাজে সমবেতনের এই আইন সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে অধিকারটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনের নিয়ম মেনে ১৯৯৬ রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একটি পর্যবেক্ষক কমিটি তৈরী হয় এবং ১৯৯৯ ২৫টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে তালিকাভুক্ত করা হয় যারা আইন ভঙ্গের কোনো ঘটনা শুনলে বা প্রত্যক্ষ করলে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবে। নাগরিক মঞ্চ ২০১৬-২০১৭ দুবার শ্রমমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে সর্বশেষ কমিটির অবস্থার কথা জানতে চায় এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কারা বা কি ধরনের অভিযোগ কমিটির কাছে এসেছে, কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে – প্রশ্ন করে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

রাজস্থান সরকারের উন্নয়নের কাজে প্রচারক তথা উন্নয়ন কর্মী ছিলেন ভানওয়ারী দেবী। সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ধর্ষিতা হন। ঘটনাটা নব্বই দশকের গোড়ার দিকের।

এই ঘটনা ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মীদের যৌন হেনস্থা নিয়ে অজস্র অভিযোগ দেশের নানান জায়গা থেকে আসতে থাকে। এই অবস্থায় কিছু সমাজকর্মী ও মানবাধিকার সংগঠন সুপ্রীম কোর্টে নারী কর্মীদের নিরাপত্তার দাবীতে জনস্বার্থ মামলা করেন। এই প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে সুপ্রীম কোর্ট দৃষ্টান্তমূলক ও ঐতিহাসিক 'বিশাখা' রায় দেন। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত 'বিশাখা গাইডলাইন' নামে যা পরিচিত।

বিশাখা রায়ের প্রায় ষোল বছর বাদে কর্মক্ষেত্রে নারীকর্মীদের যৌন হেনস্থা (নিরারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার) আইন ২০১৩ চালু হয়। এই আইন অনুযায়ি কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুস্থ ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের।

যে কোন নারী কর্মী (বয়স নির্বিশেষে) এই আইনের আওতায় পড়বেন। বেতনভোগী বা স্বেচ্ছাসেবী নিয়মিত, পার্টটাইম, স্থায়ী/অস্থায়ী বা দিনমজুর, প্রত্যক্ষ কর্মী বা পরোক্ষভাবে নিযুক্ত ছাত্রী/শিক্ষানবিশ/গৃহপরিচারিকা যিনি কর্মরতা নন, প্রয়োজনে কোন কর্মক্ষেত্রে এসে যৌন হেনস্থার সন্মুখীন হয়েছেন যেমন চাকুরীপ্রার্থী, ক্লায়েন্ট, সার্ভিস প্রোভাইডার, সাক্ষাৎকারী, সবাই এই আইনের আওতায় পড়বেন।

কর্মক্ষেত্রে যেখানে দশজন বা তার বেশি কর্মী কাজ করেন সেখানে সেই সংস্থার ইন্টারনাল কমিটি অর্থাৎ অভিযোগ শুনানি কমিটি থাকতে হবে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে কোনো ফ্যাক্টরীতে এই ইন্টারনাল কমিটি নেই, কেন নেই তার জবাবে প্রায়ই বলা হয় আমাদের এখানে তেমন কোনো অভিযোগ বা কেস নেই। সমস্যা হল আইন অনুযায়ি কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা রোধে আইসি তৈরী করা বাধ্যতামূলক, কোথাও অপরাধ কম বা বেশি তার ওপর যেমন থানা থাকবে কি থাকবে না ঠিক হয়না, তেমনিই যৌন হেনস্থার ঘটনা আছে কি নেই তার ওপর ভিত্তি করে ইন্টারনাল কমিটি থাকা না থাকার সিদ্ধান্ত হবে না। প্রয়োজনে জেলার লোকাল কমিটির কাছেও অভিযোগ জানান যায়। আইন অনুযায়ি প্রত্যেক জেলায় জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে একটি জেলা ভিত্তিক বা লোকাল কমিটি আছে।

কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনাল কমিটি না থাকলে বা অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে দশজনের কম কর্মী কাজ করেন এমন ক্ষেত্রে নারী কর্মীরা লোকাল কমিটিতে যোগাযোগ করবেন।

কর্তৃপক্ষ বা যিনি নিয়োগকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলে ও গৃহপরিচারিকা হলে তিনিও লোকাল কমিটিতে জানাতে পারবেন, যৌন হেনস্থার ঘটনায়, সমস্ত কর্মী ইন্টারনাল বা লোকাল কমিটিতে অভিযোগ জানানো ছাড়াও ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী সন্তোষকুমারি দেবী শুধু শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও তাদের কাজের সুযোগ সুবিধার জন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেননি, পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, জল, শৌচাগারের কথাও ভেবেছেন। শ্রমিক পরিবারের মেয়েরা যারা আবার অনেকেই শ্রমিক, এদের কথা আলাদা করে ভেবেছেন। বস্তিতে বস্তিতে তিনি ঘুরতেন মেয়েদের কাজে কর্মে সচেতন করার জন্য। তাদের নিয়ে সভা করতেন। সন্তোষকুমারি শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য স্কুলের ব্যবস্থা, মেয়েদের প্রসূতিকালীন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সুচিকিৎসার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১৯২৫-এ ব্রিটিশ সংসদের লেবার পার্টির সদস্য টমাস জনসন ও জন এফ সাইম ইংলন্ডের চটকল শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার চটকলগুলি পরিদর্শনে আসেন। এই সব দেখাশোনার অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁরা একটা বই লেখেন Exploitation in India যাতে বিস্তৃতভাবে তখনকার চটকলগুলির অবস্থা তুলে ধরা ধরেন। এই বইতে উল্লেখ আছে গৌরিপুর শ্রমিক সমিতির নেত্রী সন্তোষকুমারী দেবীর কথা। কম মাইনেতে কাজ পাওয়ার জন্য সর্দারদের ঘুষ দেওয়া, কাবুলিওয়ালাদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নেওয়া এবং বাসস্থানের নামে নব্বই ভাগ শ্রমিক যেখানে বাস করে সেইসব বস্তি নরক সমান, জল, হাওয়া, আলো প্রায় কিছুই নেই, ছোট একখানা অন্ধকার মাটির ঘর, যাতে চার/পাঁচজন থাকে। অসুখ লেগেই আছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, দুজন সাহেব লিখছেন "আমরা বহু জনসভায় গেছি এবং সর্বত্রই শ্রমিকরা তাদের নানান অভাব অভিযোগের কথা জানিয়েছেন – বিশেষ করে অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করা, কাজ না দিয়ে বসিয়ে রাখা, মাইনে কাটা, দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া, তাছাড়া ঘুষ, জুলুম, এসব তো আছেই। মিল মালিক ও সর্দাররা একসঙ্গে এইসব কাজ করে। আমরা সর্বত্রই ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার পরামর্শ দিলাম ..... সতর্কবাণীও উচ্চারণ করলাম যে ইউনিয়নের নেতারা যেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে ইউনিয়নকে ব্যবহার না করে তাহলে শ্রমিকের সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

[Exploitation in India, p. 16-17, 'চটকল শ্রমিক আন্দোলনের দুই সংগ্রামী নারী', মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে নেওয়া তথ্য।]

এই বইয়ের নানান অংশ পড়তে পড়তে বারবার ধাক্কা খাচ্ছিলাম এই ভেবে যে ৯৭ বছর আগে দুই সাহেব যাদের কাছে দেশের মানুষের ভাষা সহ অনেক পারিপার্শিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও যে প্রতিবেদনটি তাঁরা লিখেছেন তা যেন আজকের সময়ের প্রতিচ্ছবি। বাংলার জুট মিলের শ্রমিকের পোষাক আনুসঙ্গিক অনেক ব্যবহারিক পরিবর্তন হয়ত হয়েছে – কিন্তু বঞ্চনার, শোষণের, সর্দারদের উৎপীড়ন, লাঞ্ছনার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু রাজনীতি নিয়ে তাদের সতর্কবার্তা আজও জুট মিলে ঘুরলে দেখা যাবে। রাজনৈতিক আড়কাঠিরা মিলে মিলে নানান রং-এর ঝান্ডার তলায় কিভাবে শ্রমিক শাসনের সাম্রাজ্য চালাচ্ছে দেখতে পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৪১, ১৯৪৫ এবং ১৯৪৮-৪৯-এ তিনবার বিভিন্ন সময়ে জুট মিলে শ্রমিক পরিবার, তাদের অবস্থান নিয়ে সমীক্ষা করেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বহু বস্তিতে ঘুরে মন্তব্য করেছেন জনস্টন ও সাইম যে তথ্য দিয়েছেন তার কোন পরিবর্তন হয় নি, অর্থাৎ শ্রমিকদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। ছোট ঘরে ৭-৮ জন করে লোক ঘুমোয়, জল নেই, আলো নেই, প্রয়োজনীয় শৌচাগার নেই।"

১৯৭৯ সালে হাওড়ার চটকলে একটি সমীক্ষা করেন অধ্যাপক ও ট্রেডইউনিয়ন নেতা শিশির মিত্র। তিনি লিখেছেন –

"A sharply declining trend in the employment of women in the industry as a whole as well as in this Particular Mill.....

In the unions, the women cadres are far outnumbered by the male cadres and it is the latter who decide upon the modalities of functioning where the convenience of the women members are not always taken care of."

নারী শ্রমিক, কাজের পরিবেশ, বাসস্থান, আলোবাতাস, প্রয়োজনমতো খাবার, ক্যান্টিন, হেনস্থা, শোষণ, রিপোর্টে বলা প্রত্যেকটি বিষয়ে একই রকম আজও। একশ বছর বাদে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২২ ভদ্রেশ্বরে এক জুট মিলের নারী শ্রমিকদের সভায় শ্রমিক নেতা অমল সেন বলছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা, এদের শোষণ, বঞ্চনা, বাসস্থান, জল, শৌচাগার, এসব আজও ভয়াবহ। শতবর্ষ পরেও এর কোনো পরিবর্তন নেই কেন? সরকারি প্রশাসন কি এসবের দায় এড়িয়ে যেতে পারে? ১৯২৫-থেকে ১৯৭৯ তারপর ২০২২, আজও চটকল শ্রমিকদের অবস্থার বড় রকমের কোনো হেরফের হয়নি, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'অসমাপ্ত চটাব্দতে' লিখেছেন এক কালু সর্দারের কথা। গ্রামে সে দেবতার মত – যেন সে পরের উপকারের জন্যই জন্মেছে। দেশ থেকে ফিরত যখন সঙ্গে থাকত একদল মেয়ে। কালু সর্দার চটকলে ফিরে এসেই অন্য এক মূর্তি। সে সারাদিন মদ খেয়ে টং হয়ে ঘুরে বেড়ায়, রাতে যখন যাকে খুশি তাকে ডেকে পাঠায় তার ঘরে। কেউ আপত্তি বা প্রতিবাদ করতো না। কারণ তাহলে কাজ পাবেনা। কাজ পাইয়ে দেবার জন্য সর্দারদের নিয়মিত ঘুষ দিতে হত। চাবাগানে, চটকলে যেখানেই সর্দার ব্যবস্থা এখনও চালু কমবেশি, নারী শ্রমিকদের বঞ্চনার, শোষণের, কর্মক্ষেত্রে হেনস্থার ছবিটা প্রায় একই রকম রয়ে গেছে। সেই জন্যেই বিশেষ করে চা বাগান, জুটমিলে সর্দার, সুপারভাইজারদের নারী শ্রমিকদের মধ্যে থেকে নিয়োগের দাবী উঠেছে।

অসংগঠিতদের সংগঠিত করার মধ্য দিয়েই বাংলার শ্রমিক আন্দোলন তৈরী হয়। ১৯৫০-এর দশকের পর অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের অধিকার আন্দোলন শুরু হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক অধিগ্রহণ ও জাতীয়করণ হয়। আন্দোলন একটা পর্যায়ে দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জয়যুক্ত হয়। মূলত পাবলিক সেক্টরের ক্ষেত্রে এবং সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ও বেসরকারি বড় কারখানায় কমিউনিস্ট সংগঠনের একটা ভিত্তি তৈরী হয়। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা শ্রমিকদের মধ্যে নিজেদের ভিত তৈরী করে। কিন্তু একদম শুরুতে বাংলার শ্রমিক আন্দোলন যাঁরা করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারক এবং সংস্কারবাদী মানুষজন পরবর্তীকালে স্বদেশী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ মানুষজন এবং সন্ত্রাসবাদী বলতে যাঁদের আমবা বুঝি তাঁরাও অনেকেই শ্রমিক আন্দোলনে চলে এসেছিলেন, তাঁদের উদ্যোগেই এখানে

শ্রমিক আন্দোলন তৈরী হয় এবং সেখানে মহিলা শ্রমিক ও মহিলা নেত্রীদের বড় ভূমিকা ছিল। গাড়োয়ানদের সংগঠিত করা, হাওড়া স্টেশনের কুলিদের সংগঠিত করা, সাফাই কর্মী, ধাঙ্গড়, মেথরদের সংগঠিত করা, জুট মিল, কাপড় কল, চা বাগান, কয়লা খাদানের শ্রমিকদের সংগঠিত করার এইসব কাজ মহিলা শ্রমিক নেত্রীরা করেছেন। সন্তোষকুমারি দেবী, সাকিনা বেগম, প্রভাবতী দেবী, মৈত্রেয়ী বসু, বিমলাপ্রতিভা দেবী – প্রত্যেকে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। এর বাইরেও আরও অনেকেই ছিলেন যেমন সুধা রায়, বেঙ্গল ল্যাম্পের সুকুমারি চৌধুরী, জুট শ্রমিক নেত্রী দুখমত দিদি সহ আরও অনেকেই যাদের কথা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে লেখা হয়নি। ব্যতিক্রম বলা যায় সন্তোষকুমারি দেবীর কথা। সন্তোষকুমারি স্বদেশী আন্দোলনের সাথেই প্রথমে যুক্ত হন। চিত্তরঞ্জন দাশের অনুগামী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে ছাত্র আন্দোলনের সাফল্যের পর শ্রমিক আন্দোলনে পাঠিয়েছিলেন, কারখানা, চা বাগান, কয়লা খাদান সহ অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে মহিলা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সত্তর দশকের থেকে এইসব পরিসর থেকে মহিলা নেতৃত্ব চলে গেল বা বলা যায় সুকৌশলে মুছে ফেলা হল। সন্তোষকুমারি দেবী, সাকিনা বেগম, প্রভাবতি দেবী, বিমলা প্রতিভা দেবী, মৈত্রেয়ী বসু, এঁরা সব শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার গোড়ার যুগের লড়াকু নেত্রী, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন থাকবে শ্রমিক আন্দোলনের শতবর্ষ পেরিয়ে এসে এঁদের নেতৃত্ব, সংগ্রামের কি যথার্থ মূল্যায়ণ হয়েছে?

আমাদের প্রশ্ন থাকবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রাজনৈতিক দলবাজি ও দখলদারীর কি শিকার হয়েছিলেন এইসব মহিলা নেতৃত্ব? আমাদের প্রশ্ন থাকবে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস থেকে এঁদের মুছে ফেলা, শ্রমিক সংগ্রামের সদর্থক ইতিহাসকে নস্যাৎ করা নয়?

আমাদের প্রশ্ন থাকবে, কি কারণে কেন সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত নারী নেতৃত্ব যথা সন্তোষকুমারি, বিমলাপ্রতিভা দেবী, প্রভাবতি দেবী, সাকিনা বেগম ও আরও অনেকে হঠাৎ করে শ্রমিক আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন বা আন্দোলন বিমুখ হয়ে গেলেন?

এর উত্তর আমরা খুঁজছি – আপনারাও খুঁজুন।

শ্রমজীবী নারী কথা তথ্যে

মহিলা কর্মী কাজে অংশগ্রহণের হার ১৯.৭ শতাংশ। এর মধ্যে গ্রামীণ ভারতে মহিলা শ্রমজীবী অংশগ্রহণের হার ১৬.১ শতাংশ। [এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে Periodic Labour Force Participation Rate Survey 2018-19]

২১.৯ শতাংশ শহরে মহিলারা কর্মহীন/বেকার
১৫.৩ শতাংশ; গ্রামীণ মহিলারা কর্মহীন/বেকার
১০.৯ শতাংশ, ভারতে পুরুষ কর্মহীন/বেকার
১৭.৯ শতাংশ ভারতে মহিলারা কর্মহীন/বেকার

৯০ শতাংশ শহরাঞ্চলে মহিলা যাদের ১৫বছর বয়স বা তার বেশি তাঁরা কাজ চাননা এবং পাননা।

ভারতে

৪০-৪৪ বছর বয়সের অধিকাংশ মহিলা কর্মজীবী; মোট মহিলা কর্মী তথা শ্রমিকদের মধ্যে।

২০-২৪ বছর বয়সের মহিলা কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে সর্বাধিক। এই বয়সের বেকার মেয়েরা বর্তমানে সক্রিয়ভাবে কাজ খুঁজছে।

কাজ করেন যে মহিলারা তাঁদের ৯৪ শতাংশ ইনফরমাল ক্ষেত্রে কাজে যুক্ত।

কাজ করেন যে মহিলারা তাঁদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ স্বনিযুক্ত।

তৃতীয় দফার লকডাউনে ৭৫ শতাংশ মহিলা কর্মজীবী ইনফরমাল ক্ষেত্রে কাজ হারিয়েছেন।

মহিলা হকার্স এবং ভেন্ডারদের ৯৭ শতাংশ এর আর্থিক অবস্থানে প্রভাব ফেলেছে।

পরিবার বা কমিউনিটি বা ঋণদানকারী ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে ৮০ শতাংশ মহিলা কর্মজীবী ঋণ নিয়েছেন।

ভারতে মহাত্মাগান্ধী ন্যাশনাল রিনিউয়াল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমে (এম জি এন আর ই জি এ) মহিলারা কাজ পেয়েছেন।

২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
৫৩.১ শতাংশ	৫৪.২ শতাংশ	৫৪.৫ শতাংশ	৫২.৪ শতাংশ

নারী শ্রম

ভারতে মোট নারী শ্রমিক		১৫ কোটি
এর মধ্যে	গ্রামে	১২ কোটি ২ লক্ষ
	শহরে	২ কোটি ৯৮ লক্ষ

- কৃষিকাজে নারী — ৩ কোটি ৬০ লক্ষ
- ক্ষেত মজুরি করেন — ৬ কোটি ৫০ লক্ষ
- হাউসহোল্ড শিল্পে — ৮৫ লক্ষ
- অন্যান্য ক্ষেত্রে — ৪ কোটি ৫ লক্ষ

Women from an integral part of the Indian workforce. According to the information provided by the office of Registrar General & Census Commissioner of India, As per Census 2011, the total number of female workers in India is 149.8 million and female workers in rural and urban areas are 121.8 and 28.0 million respectively. Out of total 149.8 million female workers, 35.9 million females are working as cultivators and another 61.5 million are agricultural labourers. Of the remaining females workers, 8.5 million are in household Industry and 43.7 million are classified as other workers.

As per Census 2011, the work participation rate for women is 25.51 percent as compared to 25.63 per cent in 2001. The Work Participation Rate of Women has reduced marginally in 2011 but there is an improvement from 22.27 per cent in 1991 and 19.67 per cent in 1981. The work participation rate for women in rural areas is 30.02 per cent as compared to 15.44 per cent in the urban areas. (*Work participation rate gradually decline*)

In so far as the organised sector is concerned, in March, 2011 women workers constituted 20.5 percent of total employment in organised sector in the country which is higher by 0.1 percent as compared to the preceding year. As per the last Employment Review by Directorate General of Employment & Training (DGE&T), on 31st March, 2011, about 59.54 lakh women workers were employed in the

organised sector (Public and Private Sector). Of this, nearly 32.14 lakh women were employed in community, social and personal service sector.

List of protective provisions for women employees:
Some of the important protective provisions for safeguarding the interests of working women are:

স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত ব্যবস্থা ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট ১৯৪৮
Safety/Health Measures

- Section 22(2) of the Factories Act, 1948 provides that no woman shall be allowed to clean, lubricate or adjust any part of a prime mover or of any transmission machinery while the prime mover or transmission machinery is in motion, or to clean, lubricate or adjust any part of any machine if the cleaning, lubrication or adjustment thereof would expose the women to risk of injury from any moving part either of that machine or of any adjacent machinery.

- Section 27 of the Factories Act, 1948 prohibits employment of women in any part of a factory for pressing cotton in which a cotton opener is at work.

রাতের বেলা মেয়েদের কাজে নিষেধ আইন
Prohibition of Night Work

- Section 66(1)(b) of the Factories Act, 1948 states that no woman shall be required or allowed to work in any factory

except between the hours of 6 a.m. and 7 p.m.

- Section 25 of the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 stipulates that no woman shall be required or allowed to work in any industrial premise except between 6 a.m. and 7 p.m.

- Section 46(1)(b) of the Mines Act, 1952 prohibits employment of women in any mine above ground except between the hours of 6 a.m. and 7 p.m.

Prohibition of Sub-terrain Work

- Section 46(1)(b) of the Mines Act, 1952 prohibits employment of women in any part of a mine which is below ground.

মাতৃত্বকালীন সুবিধা
Maternity Benefit

- The Maternity Benefit Act, 1961 regulates the employment of women in certain establishments for certain periods before and after child-birth and provides maternity benefits. The Building and Other Constructions (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 provides for maternity benefit to female beneficiaries of the Welfare Fund.

আলাদা প্রস্রাবখানা/টয়লেট নারী কর্মীদের জন্য যা আইনে আছে
Provisions for Separate Latrines and Urinals

Provision for separate latrines and urinals for female workers exist under the following Rule 53 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.

- Section 19 of the Factories Act, 1948.

- Rule 42 of the Inter State Migrant Workmen (RECS) Central Rules, 1980.

- Section 20 of the Mines Act, 1952.

- Section 9 of the Plantations Labour Act, 1951.

আলাদা শৌচাগার নারী কর্মীদের জন্য যা আইনে আছে
Provisions for Separate Washing Facilities

Provision for separate washing facilities for female workers exists under the following:

- Section 57 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.

- Section 42 of the Factories Act.

- Section 43 of the Inter-State Migrant Workmen (RECS) Act, 1979.

শিশু সন্তানদের রাখার জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা আছে

Provision for Crèches: Provision for crèches exists under the following:

- Section 48 of the Factories Act, 1948.
- Section 44 of the Inter State Migrant Workmen (RECS) Act, 1979.
- Section 12 of the Plantations Labour Act, 1951.
- Section 14 of the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966.
- Section 35 of the Building and other Constructions (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

LAW RELATED TO WOMEN PROTECTIONS

The Indian Constitution
As a "Fundamental Right," the Constitution guarantees equality.
Article 15 includes provisions for women, children, and individuals who are socially and educationally disadvantaged. These provisions are not discriminatory in any way.

In matters of public employment, Article 16 guarantees equal opportunity. Women are guaranteed one-third seats in Panchayats under the 73rd Amendment Act of the

Constitution, and one-third seats in Municipalities under the 74th Amendment Act.

The National Commission for Women Act, 1990

Creates a National Commission for Women to review existing statutory protections for women, prepare periodic reports to the Central Government on matters relating to safeguards for women's rights, investigate complaints of deprivation of these rights, and provide financial assistance in the litigation of issues affecting women.

কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 is a legislative act in India that seeks to protect women from sexual harassment at their place of work. This statute superseded the Vishakha Guidelines for prevention of sexual harassment introduced by the Supreme Court of India. The Bill lays down the definition of sexual harassment and seeks to provide a mechanism for redressing complaints. It provides for the constitution of an 'Internal Complaints Committee' at the workplace and a 'Local Complaints Committee' at the district and block levels. A District Officer (District Collector or Deputy Collector), shall be responsible for facilitating and monitoring the activities under the Act. Prohibits sexual harassment of women at work.

The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016
On March 9, 2017, the Indian Parliament passed a law offering women working in the organized sector

compensated maternity leave of 26 weeks, up from the current 12 weeks, a decision that will benefit approximately 1.8 million women. The law will apply to all businesses with ten or more employees, and the benefit will be limited to the first two children. The entitlement for the third child will be 12 weeks. As a result, India now has the third-highest maternity leave in the world. Canada and Norway offer 50 weeks and 44 weeks of paid maternity leave, respectively.